মাস্তুরাত সিরিজ ০২ নারীর দীন পালনের প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান

উইমেন গাইড

মাস্তুরাত টিম

জাফর বিপি
সম্পাদিত

NEON

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: নারীবাদের বিষবাষ্প

সহধর্মিনী বনাম সহকর্মী / ১২
-ফাতিমা আফরিন

দ্বিতীয় অধ্যায়: পর্দার অন্তরায় ও প্রতিকার

আত্মসংশোধন / ২২
-উম্মে আইমান

সুখী মানুষের প্রতিচ্ছবি / ৩৫
-সালমা আক্তার মিতু

তৃতীয় অধ্যায়: ফ্রি-মিক্সিং

বাবা / ৪৫
-আকীফা বিনতে আমীন

একটি লাল নোটবুক / ৫৭
-নাদিয়া নুর

চতুর্থ অধ্যায়: নারীদের নামায

প্রশান্তি / ৬৩
-হালিমা সাদিয়া

প্রত্যাবর্তনের পথে / ৭২
-ইসরাত তুরা

আক্ষেপ / ৮৩
-সাজেদা আল হোসাইনী

পঞ্চম অধ্যায়: নারীর অন্দরমহল

পদ্মফুল / ৯২
-সাদিয়া আফরিন

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রেম-বিরহ

আঁধারে আলোর দিশা / ১০৯
-জুমানা মুশতারী

মাটির ঘর / ১১৯
-সাইমা জান্নাত মাওয়া

জান্নাতের পথে যাত্রা / ১৩২
-নওশীন তাবাচ্ছুম

সপ্তম অধ্যায়: নারীর বিয়ে সমাচার

তাহার পানে / ১৪৩
-আফসানা মিমি

রুহামা / ১৫৩
-সিদরাতুল মুনতাহা

মুসহাফ / ১৬৩
-আফসানা বিনতে আসাদ

অষ্টম অধ্যায়: নারীর কর্মজীবন

হৃদয়ের হিজরত / ১৭২
-সিরাজাম বিনতে কামাল

বোধদয়ের চিরকুট / ১৮১
-মাহিরা

সহধর্মিনী বনাম সহকর্মী

ফাতিমা আফরিন

এক.

নিঝুম রাত, কোলাহল মুক্ত চারপাশ। নিস্তব্ধ নগরী। কোথাও কোনো শব্দ নেই। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো মিটিমিটি জ্বলছে। ফাইরুজ অশান্ত মনে কফির মগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকের কফি তার কাছে বিস্বাদ লাগছে। অথচ সে কফিপ্রেমী। মন যখন খারাপ থাকে, তখন প্রিয় জিনিসও অপ্রিয় হয়ে যায়।

এই আঁধার রাতে তার চোখে ঘুম নেই। ঘুম না থাকারই কথা। সংসারের অশান্তি, বসের কড়া ঝাড়ি এসব আর ভালো লাগে না তার। সংসারে অশান্তি হলে, বিশাল এই পৃথিবী তখন বদ্ধ কুয়ো মনে হয়।

পাঁচবছর বয়সী তার ফুটফুটে একটা মেয়ে আছে। স্বামী ইউনিসেফে চাকরি করে। নাম, সাফওয়ান। বেশ পয়শাওয়ালা বলা চলে। ফাইরুজ মাস্টার্স শেষ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনই সারাদিন ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যার পর অবসার পায়। ফাইরুজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। কুরআন পড়তে পারে মোটামুটি। যতটুকু সম্ভব পর্দা রক্ষা করে চলে। অফিসে বোরকা পরে আসাযাওয়া করে। একারণে বসের ঝাড়িও খেয়েছে অনেক।

কলিগরা প্রায়ই হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে। সে ভ্রুক্ষেপ করে না। নিজ গতিতে চলে। তার একটাই কথা, আমি পর্দা রক্ষা করে সব করবো, তাতে যত বাধা আসে আসুক। আমি কাউকে পরোয়া করি না। মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ে ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে।

স্বামী-স্ত্রী সারাদিন অফিস করে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে। ছোট্ট মেয়েটা এতিমের মত বুয়ার কাছে মানুষ হতে থাকে। দিনশেষে স্বামী-স্ত্রী দুজনই ক্লান্ত। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা মা মা করে কোলে উঠতে চায়। মায়ের সোহাগ পেতে চায়।

ফাইরুজ মেয়েকে কোলে নিয়ে একটু আদর করে বুয়ার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ক্লান্ত শরীরে মায়া কাজ করে না। তখন মনে চায় বিছানায় চড়ে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে।

প্রতিদিন সকালে ভোরের পাখির কলবর শোনা যায়, সবুজ ঘাসের কঁচি ডোগায় শিশির জমা হয়, পূর্বদিগন্তে সূর্য্যিমামা কিরণ ছড়িয়ে পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলে।

রুটিন অনুযায়ী ফাইরুজের জীবনও চলতে থাকে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবনকে এগিয়ে নিতে চায় সে। স্বামীর পয়সা আছে, তবুও সে কীসের এক মোহ-টানে আবদ্ধ হয়ে আছে। তার ভাষ্য হলো—স্বামীর আছে তাতে কী! তার নিজের তো কোনো উপার্জন নেই।

স্বামীর কাছে হাত পাততে হবে এটা সে কিছুতেই চায় না। এখন যুগ বদলেছে, মানুষ পাল্টেছে। সরকার নারীর অধিকার দিয়েছে। নারীর ক্ষমতা এখন আকাশচুম্বী! নারী ক্ষমতায়নের এই স্বর্ণযুগে এত পড়ালেখা করে এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানে হয় না।

ফেসবুক-ইউটিউবে ঢুকলেই হরেকরকম নারীদের দেখা যায়। একেকজন একেক আইটেম নিয়ে নানারকম পশরা সাজিয়েছে। পণ্যের প্রচারণার জন্য লাইভ করছে। শুধু লাইভ করছে বললে ভুল হবে, নিজেকেও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীতে প্রদর্শন করছে।

ফাইরুজ এসব দেখে ভাবে—সবাই পারলে পর্দার ভেতর থেকে আমি কেন ব্যবসা করতে পারব না! আমিও করব। কলিগদের উপহাসের পাত্রী আর হতে চাই না। বসের কুদৃষ্টি আর ভালো লাগে না।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ফাইরুজ। ফাইরুজ চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় সাফওয়ান বেশ খুশি। সে ভাবলো, ফাইরুজ এবার সংসারে মনোযোগী হবে। সন্তানকে সময় দেবে। ওকে বুয়ার অশিক্ষিত হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের সুশিক্ষিত হাতে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

সাফওয়ান বেশ উচ্ছ্বাসের সাথে বলল, 'তুমি চাকরি ছেড়ে খুব ভালো করেছো।'

ফাইরুজ বলল, 'চাকরি ছেড়েছি ঠিকই, তবে আমি অনলাইন বিজনেস করতে চাই। আস্তে আস্তে একটা শোরুম নেব। তারপর কর্মী রেখে কাজ করব। আইডিয়াটা কেমন?'

'কীসের বিজনেস করতে চাও?'

'বোরকা, খিমার, থ্রিপিস এগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই। আস্তে আস্তে আরও আইটেম বাড়ানো যাবে।'

সাফওয়ান ভাবলো—চাকরির চেয়ে এটা ভালো হবে। আমি যতই বলি এসব করার দরকার নেই, সে শুনবে না। বলে লাভ নেই। একরোখা-জেদি মেয়ে সে। সবকিছু ভেবেচিন্তে বলল, 'আচ্ছা করতে পারো সমস্যা নেই।'

সবার দেখাদেখি সে একটা ফেসবুক পেইজ খুলেছে। সাথে একটা গ্রুপ। পণ্যের ছবি ছেড়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। প্রথম দিকে অল্প অর্ডার আসলেও আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে চলতে থাকে বেশকিছু দিন। পেইজ বড় হচ্ছে, ফ্যান ফলোয়ার বাড়ছে। ধীরেধীরে ব্যবসাও প্রসার হচ্ছে।

আত্মসংশোধন

উম্মে আইমান

বৈচিত্র্যময় রঙে শোভিত পৃথিবীর স্বপ্নিল আঙ্গিনায় পা দিয়ে স্বপ্ন বুনছে নবীনরা। হাত বাড়াচ্ছে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরের দিকে।

কতটুকু সফল হবে তারা, সেটা তাদের জানা না থাকলেও স্বপ্নের পথে অবিরাম হাঁটতে তাদের কোনো কার্পণ্য নেই। আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে চারিপাশ।

আকস্মিক দ্বীনের শীতল ছোঁয়া পেয়ে যাওয়া মানুষেরা রঙিন সুতোর মায়াজাল ভেদ করে মুক্ত বাতাসে ডানা ঝাপটানো হৃদয়ে পরিয়ে দেয় লাগামের বেড়ি। আর এটা শুধু মহান রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

শ'খানেক কথার দরকার নেই দুটো কথাই যথেষ্ট কারো জীবনটা বদলে দিতে, আনমনে এটাই ভাবছিলো সাবিহা।

উত্তরের সর্বশেষ জেলা পঞ্চগড়। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর, সুখের সমারোহে ঘেরা চারিপাশ। একদিকে দিগন্ত বিস্তৃত চা বাগান, অন্যদিকে বাংলার আলপথ দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া দুইবাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

মহারাজা দিঘীর অকৃত্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারা বহন করে চলেছে মহানন্দা নদী। এই নদীর তীরে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

নদীর তীর থেকে খানিকটা দূরেই সাবিহাদের বাড়ি। সাবিহারা দুই ভাইবোন, বাবা-মার সবটা জুড়ে ওদের বিচরণ। বাবা সরকারি কর্মকর্তা। বেশ ভালোভাবেই দিনকাল অতিবাহিত করছে ওরা।

সাবিহা ফেসবুকের কল্যাণে দ্বীনের আলোর সন্ধান পায়, যদিও এর মূল সূচনা অন্যখানে। তবুও ইসলাম সম্বন্ধে ওর অজানা অনেক কিছু জানার পিছনে ফেসবুকের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নাম মাত্র মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্ম গ্রহণ করেছে, ইসলামিক কালচারে ও বড় হয়নি।

ইসলাম সম্পর্কে সাবিহার জ্ঞান এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিলো যে, 'রমজান মাসে নামাজ রোজা করতে হয়, দান- সাদকাহ করতে হয়, মুসলিমদের উৎসব দুটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।'

একটা মুসলিম ফ্যামিলির সন্তান যেখানে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মসজিদের পানে কায়দা নিয়ে ছুটে যাওয়ার কথা সেখানে তথাকথিত আধুনিক ফ্যামিলির বাচ্চারা একগাদা বইয়ের ভারে হাঁটতে পারেনা। তবুও দু-তিনটা প্রাইভেটে প্রতিদিনই যেতে হয়। ছোট থেকেই পাঠ্যপুস্তকের দিকে ঝোঁক দিতে হয়েছে।

বাবা-মার কথা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, বিসিএস ক্যাডার ইত্যাদি হতে হবে, না হলে জীবন ব্যর্থ। 'অর্থাৎ জীবনে সফল ব্যক্তি হতে হলে পড়াশোনার বিকল্প কিছুই নেই। এই বীজমন্ত্রটি খুব পাকাপোক্ত ভাবে মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এভাবেই আস্তে আস্তে ওদের স্বপ্নের জগত ভিন্ন হতে থাকে। সাবিহা এখন এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে।

ইদানিং প্রায়ই প্রাইভেট থেকে ফেরার পথে কিছু ছেলে খুব উত্ত্যক্ত করছে। আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের জন্য পর্দা ফরজ করেছেন। পর্দা নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত। অন্যের কুদৃষ্টি থেকে নিজের ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করার। এটা এতোদিনে ও উপলব্ধি করলো।

সাবিহা তার আম্মুকে বললো, 'আমি বোরকা বানাবো।'

আকস্মিক মেয়ের কাছে একথা শুনে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তোর কি এখনি বোরকা পরার বয়স হয়েছে? যেখানে তোর মা হয়ে আমিই পরি না। আর তুই পরবি! তোর কি জামা-কাপড়ের অভাব পড়েছে নাকি! সামনে পরীক্ষা, পড়া বাদ দিয়ে উনি আসছে হুজুরাণী হতে!' আসমা বেগম বেশ কটাক্ষ করে কথা গুলো বললেন।

বাবা

আফীফা বিনতে আমীন

এক.

স্কুল থেকে নীরাকে নিয়ে গাড়ি করে বাসায় ফিরছেন ডা. সিরাজ আহমেদ। রাস্তার ডান পাশে একসারি বাহারি মিষ্টির দোকান; কাচের তাকে সাজানো মিষ্টির দিকে তাকিয়ে সিরাজ সাহেবের চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু মেয়ের দিকে চোখ পড়তে মুহূর্তেই চুপসে যান তিনি।

রাগি চোখে কটমট করতে করতে নীরা বলল, 'তোমার ডায়াবেটিস? ফের মিষ্টিতে চোখ? ডাক্তারের এই অবস্থা হলে রোগীরা কী করবে শুনি?'

মেয়ের কথায় তিনি খানিক লজ্জাবোধ করলেন। অতঃপর চুপচাপ গাড়ি চালানোয় মনোযোগ দেন।

বিকেল গড়াতেই চুপিচুপি গিয়ে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে আসে নীরা। রাতে একটা মিষ্টি এনে মুখে পুরে দিয়ে বলে, 'বুঝলে বাবা! ভেবে দেখলাম তোমাকে মিষ্টি না খাওয়ালে মনে মনে ভাববে—তোমার মা তোমাকে ভালোবাসে না, তাই নিয়েই এলাম।'

সিরাজ সাহেব হো হো করে হেসে দেন মেয়ের কাণ্ড দেখে। নীরার দিকে তাকিয়ে ভাবেন—ছোট্ট মেয়েটা কত অল্প বয়সেই বড়দের মতো বোঝে। প্রতিটি মেয়ে জন্মগতভাবে ভেতরে একটা মাতৃসত্তা ধারণ করে বলেই হয়ত 'মা' ডাকে এত নির্মলতা।

বাবা-মেয়ের ছোট্ট সংসারে চলে একে অপরকে বুঝে নেয়ার অদৃশ্য প্রতিযোগিতা। মেয়ের গায়ে যেন দুঃখের আঁচটুকুও না আসে সে ব্যাপারে বাবা যথেষ্ট যত্নশীল। মেয়েটিও হয়েছে তাই; মুখ দেখেই বাবার মন পড়ে ফেলতে পটু।

মা হারা মেয়েটাকে পুতুলের মত বুকে আগলে মানুষ করেছেন সিরাজ সাহেব। কখনো যেন মায়ের অভাব মনে না হয় এজন্য নিজেই হয়েছেন মা, বাবা, বন্ধু সব। মেয়ে বড় হবার সাথে সাথে বাবার চিন্তাও সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলে। চারপাশে যে হারে বখাটে হায়েনার অবাধ বিচরণ—তাতে মেয়েটাকে চোখের আড়াল হতে দিতেই যত ভয়...

দুই

সকাল থেকে নীরাকে বেশ চুপচাপ লাগছে। মেয়েটাতো এমন করে না কখনো! চিন্তায় পড়ে গেলেন নীরার বাবা। মেয়েকে ডাকলেন এক কাপ চা করে দেবার অজুহাতে। চা নিয়ে আসতেই কাছে ডেকে বললেন, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার মন ভালো নেই। কিছু হয়েছে মা?'

'অনেক কিছু হয়েছে বাবা।'

'তো কিছু না বলে এমন মুখ কালো করে থাকলে তো আমারও মন খারাপ হয়।'

'অরুর কথা বলেছিলাম না তোমাকে? বারণ করেছিলাম ওকে নাহিদের সাথে সম্পর্ক রাখতে। ভেঙেও দিয়েছিলো সবটা। ব্রেকআপ করায় আজ কোচিংয়ে যাবার পথে....।'

কান্না আটকাতে গিয়ে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে নীরার।

'কী বলছো? কী করেছে সেই ছেলে? অরুর কিছু হয়নি তো?' সিরাজ আহমেদের কণ্ঠে আতঙ্ক!

'গ্যাং-রেপ বাবা। অরু হাসপাতালে; ও বোধহয় বাঁচবে না।'

নীরা কাঁদছে। সিরাজ আহমেদ পাথরের মতো বসে আছেন। তার কানে মেয়ের বলা শেষ কথাগুলো পৌনঃপুনিকভাবে বেজে চলেছে।

নাহিদ ছেলেটাকে তেমন সুবিধার কখনোই মনে হতো না নীরার। তবু উচ্ছৃঙ্খল টাইপের এই ছেলের মায়ায় জড়িয়ে যায় অরু। অনেকভাবে বুঝিয়ে নীরা ওকে বিপথে যাওয়া থেকে ফিরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাহিদ এতটা নীচে নামবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। ওর ইচ্ছে হচ্ছে জানোয়ারটাকে খুন করে ফেলতে।

না, সেদিন অরু মরেনি; তবে যেভাবে বেঁচে আছে—সে বাঁচাকে আদৌ বেঁচে থাকা বলে কিনা জানা নেই নীরার। অপরাধীগুলোর শাস্তির জন্য সিরাজ আহমেদ চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি, তবু ওরা দুদিন জেল খেটে ঠিকই বের হয়ে গেছে।

সিরাজ আহমেদ মনে চাপা ক্ষোভ আর একরাশ হতাশা চেপে মেয়েকে নিয়ে ট্রান্সফার হয়ে যান নিজ শহরে।

তিন.

প্রতিদিন পেপার-পত্রিকায় অমন হাজারো ধর্ষণের গুঞ্জন উঠলেও অরুর এ ঘটনায় ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায় এক বাবার ভয়ার্ত মন। এ দেশে অপরাধীর বিচার হয় না, যেটুকু হয়—তা হয় ভুক্তভোগীর।

নীরা একেবারে চুপসে যায়। কিছুদিন স্তব্ধ হয়ে থাকেন নীরার বাবাও। শেষমেশ অনেক ভাবনা-চিন্তার পর নীরাকে একটা মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন তিনি।

এ সিদ্ধান্তে নীরা খুব একটা খুশি হয়নি দেখে সিরাজ সাহেব মেয়েকে কাছে ডেকে বোঝান—আমি অনেক ভেবেছি মা, অরুর এই ঘটনাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি এতদিন। তাতে আমি অনেকগুলো বিষয় বুঝতে পেরেছি, আর এমন ঘটনার পেছনে অনেক কারণও দায়ী। সেসব কারণের একটি হলো—ছেলে-মেয়ের 'ফ্রি মিক্সিং'।

দম নিয়ে আবার বলতে থাকেন—ভেবে দেখো, এতে প্রথমেই ছেলে-মেয়েরা একটা খোলামেলা পরিবেশ পায়। যার প্রভাবে আস্তে আস্তে ওদের মধ্যে